"আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতা এবং প্রাসঙ্গিক কথা" পুস্তিকাটি সম্পর্কে মন্তব্য ॥

অধ্যাপক কবীর চৌধুরী

দেশ যে সাতিশয় সংকটে নিপতিত হবে তা অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায় নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রি নিয়োগে। সাম্প্রতিক রদবদলের পর পত্রিকায় দেখেছিলাম, সরকারের 'চালিকা শক্তি' বলে খ্যাত মেজর জেনারেল (অবঃ) মতিন ক্ষুব্ধ, তিনি পদত্যাগ করবেন বলেছিলেন। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ড. ফখরুদ্দীন তাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি নিযুক্ত করেন। গত কয়েকটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বেই ছিল। এবার ব্যতিক্রম। এ ঘটনা ও পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহ থেকে বোঝা যায় ড. ফখরুদ্দীন সরকার সিভিল ফেস, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু, দেশকে যে তিনি সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছেন তা অনেকটা স্পষ্ট। আমার জীবিতকালে [এ ভূখণ্ডের নাম তিনবার বদল হয়েছে, অগণিত শাসক এসেছেন গেছেন] এ ভূখণ্ডের **১১** জন শিক্ষককে গ্রেফতার করে নির্যাতন করা হয়নি। সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি হিসেবে নিযুক্তি। এ নিযুক্তি স্পষ্ট করেছে ড. ফখরুদ্দীনের [বা জনান্তিকে, জে. মঈন] সরকারের ঝোঁক কোন দিকে। এ মন্তব্য করছি জেনারেল মতিনের "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতা এবং প্রাসঙ্গিক কথা" বইটি পড়ে। তার রচিত এ গ্রন্থে তিনি তার চিন্তাভাবনা স্পষ্ট করেছেন। উল্লেখ্য, এ বইটি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় এ. জেড. এম. আবদুল আলী, শাহরিয়ার কবিরসহ অনেকে আলোচনা করেছেন। এ সব আলোচনা পড়ে বইটি সংগ্রহ করে পড়ি। এবং এটি পড়ে আমি যুগপৎ ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ এবং বিস্মিত হয়েছি। পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকা বইমেলায় ২০০০ সালে, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে। এর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ওই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে এবং এর তৃতীয় মুদ্রণ হয় ২০০৩ সালে অক্টোবরে।

বইটি পড়লে প্রথমেই স্পষ্ট হয়ে যায় এই ব্যক্তি অসম্ভব রকমের উগ্র-সাম্প্রদায়িক এবং চরম ভারত বিদ্বেষী। উল্লেখ্য, ইনি পাকিস্তানী আদলে তৈরি একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন। সে সময় তিনি বাংলাদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বিষোদগার করেছিলেন দৈনিক ইনকিলাবে। তার মন্তব্যের সারকথা ছিল যা জামায়াতে ইসলামি ও বিএনপির মুখপত্ররা হরদম বলে থাকে যে, বুদ্ধিজীবীরা ভারতীয় বা 'র'-এর এজেন্ট। তখন তা নিয়ে মাথা ঘামাই নি। এখন স্পষ্ট হলো সাম্প্রদায়িকতা, ভারত বিদ্বেষ এর মজ্জাগত। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক—

'রাজনৈতিকভাবে এ দেশের স্বাতন্ত্র্যকে মুছে ফেলার জন্য দেশের এক দশমাংশ ভূখণ্ড (পার্বত্য চট্টগ্রাম)-কে অন্যের দখলদারিত্বে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, এ দেশের বুকের উপর দিয়ে ভারতের মতো আগ্রাসী শক্তিকে করিডোর দেয়ার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হচ্ছে। ভারত থেকে সামরিক যানবাহন ক্রয় করে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ভারত নির্ভর করে তোলা হচ্ছে। ভারতে গ্যাস রপ্তানী, ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি, এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে ব্যবহারের জন্য দিল্লীর হাতে তুলে দেয়ার মতো দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্নকারী পদক্ষেপ গ্রহণের তৎপরতা চলছে।' (পৃষ্ঠা ৬)

'বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে বলে জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়ে যায়নি। ভারত ও বাংলা বিভক্তি তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত দ্বিজাতিতত্ত্বের বাস্তবতার সুফসল। প্রতিবেশী ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার সীমান্ত রেখা আজ এক বাস্তব সত্য। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে বিধায় বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এবং পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ধর্ম-বিশ্বাস, জীবন-দর্শন, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত পার্থক্য মুছে যায়নি; মুছে যায়নি তাদের মধ্যকার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা ও বিবাহ পদ্ধতি; মুছে যায়নি তাদের পরস্পর বিরোধী জীবন-দর্শন ও মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নিজ নিজ সংস্কৃতি।' (পৃষ্ঠা ৭)

'বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রতিবেশী ভারতের প্রভাবমুক্ত এবং আক্ষরিক ও বাস্তব অর্থে স্বাধীন সার্বভৌম রাস্ট্র হিসেবে একে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও চেতনার পাশাপাশি সাতচল্লিশের চেতনাকে হৃদয়ে লালন করতে হবে।' (পৃষ্ঠা ৮)

‘১৯৪৭ সালে আমরা ভারত থেকে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ছিলাম বলেই অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়েছিল। তাই আজকের বাংলাদেশ ’৪৭-এর চেতনার ধারাবাহিকতা মাত্র। কারণ ’৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত না হলে, ’৭১-এ বাংলাদেশ হতো না। সুতরাং পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নতা, মুসলিম উম্মা তথা ইসলাম কিংবা মুসলিম পরিচিতি থেকে আমাদের বিচ্ছিন্নতা নয়। মুসলিম অধ্যুষিত একটি রাষ্ট্র ভেঙ্গে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। আজ যে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে টিকে আছে তার মূলে রয়েছে এর নিজস্ব পরিচিতি বা আইডেন্টিটি (identity), যার ভিত্তিমূলে রয়েছে এর সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য। বাংলাদেশ আজ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এক স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদায় বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই, ’৪৭-এর চেতনাকে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, কারণ ’৪৭-এর চেতনা বিস্মৃত হলে একদিকে যেমন আমাদের ’৭১-এর চেতনার অপমৃত্যু ঘটবে, তেমনি আমাদের মাঝে ’৪৭-এর চেতনার বিলুপ্তি ঘটলে এদেশে মুসলিম স্বাতন্ত্রবোধেরও অপমৃত্যু ঘটবে।’ (পৃষ্ঠা ৩৯)

জেনারেল মতিন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এবং উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি হয়ত ভুলে গেছেন যুদ্ধ করেছিলেন তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে। কিন্তু, যুদ্ধে তার মতো যারা যোগ দিয়েছিলেন এখন তাদের অনেকের মন্তব্য শুনে মনে হয় তাদের আনুগত্য ছিল অন্যের প্রতি এবং বাধ্য হয়েই তারা যুদ্ধ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পদকের যে সামরিকায়ন হয়েছিল তা সবার জানা। অধিকাংশ পদক দেয়া হয় সামরিক বাহিনীর সদস্যদের, যাদের মধ্যে তিনি একজন। পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘিষ্টদের দমনের জন্যও বীরবিক্রম ও বীরপ্রতীক প্রভৃতি উপাধি বিলি করে মুক্তিযুদ্ধের স্পিরিটের দফারফা করা হয়েছে। যা হোক এ হেন ব্যক্তি যিনি ‘বাঙালি জাতি’র জন্য লড়াই করে উপাধি পেয়েছেন ধরা হয়— তিনি লিখেছেন, ‘প্রকৃতপক্ষে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ইতিহাসে আছে বলে আমাদের জানা নেই। বাঙলা ভাষাভাষী তথা বাঙালী হিসেবে আমাদের অনুভূতি বা চেতনা এক জিনিস আর ‘বাঙালী জাতীয়তাবাদ’ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। হাজার বছরের বাঙালী ঐতিহ্যের নামে এ বিশেষ মহলটি যে অপপ্রচার করে বেড়াচ্ছে, তা একদিকে যেমন অস্পষ্ট অন্যদিকে তেমনি তা বিভ্রান্তিকর।’ (পৃষ্ঠা ৬১)

‘এদেশের জনগণের মাঝে বিভেদ জিইয়ে রাখার জন্য এবং জাতিকে বিভক্ত করার প্রয়াসে আজকাল ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’ নামে একটি আপ্তবাক্য প্রায় সারাক্ষণ বেশ কৌশলের সাথে ব্যবহার করা হয়। আবার কখনো বা একে ‘মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষশক্তি’ নামে অভিহিত করে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়।’ (পৃষ্ঠা ৬৩)

উপদেষ্টা থাকাকালীনই তিনি মন্তব্য করেছেন এতদিন পর যুদ্ধাপরাধী কে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। অনুমান করে নিতে পারি, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধে জামায়াত ও আইএসআই-এর অনুপ্রেবেশ ঘটেছিল, যারা ১৯৭৫ সালের হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে এখন পর্যন্ত নানা ছদ্মনামে ক্ষমতায় আছে। এদিক থেকে দেখতে গেলে আইএসআই ও জামায়াত সফল। মতিন শুধু নয় মঈনুল হোসেনও প্রবলভাবে জামায়াতের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। ভাবতে অবাক লাগে তিনি ছিলেন মানিক মিয়ার পুত্র।

সামরিক বাহিনীর যারা যুদ্ধে গিয়েছিলেন তাদের সিংহভাগ জিয়া ভক্ত। এতে প্রমাণিত তাদের আনুগত্য সিভিল কর্তৃত্বের প্রতি নয়। সব সময় সামরিক কর্তৃত্বের পক্ষে যা মুক্তিযুদ্ধ চেতনার বিরুদ্ধে— এ কথা আজ পরিষ্কারভাবে বলার সময় এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের বিকৃতায়ণে ও সামরিকায়ণে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। দেখুন কীরকম মিথ্যাকার করেছেন এই জেনারেল— ‘একাত্তরে ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী যখন এদেশের অপ্রস্তুত অসংগঠিত নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ নেতারা সকলেই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, শেখ মুজিবুর রহমান আত্মসমর্পণ করেন পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছে, ভীত-সন্ত্রস্ত জাতি যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ঠিক তখন বজ্রনিনাদে গর্জে ওঠেন সময়ের সাহসী সন্তান জিয়াউর রহমান। চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে ইথারের স্রোতে ভেসে আসে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তরুণ মেজর জিয়াউর রহমানের এক অতি সুদৃঢ় প্রত্যয়দীপ্ত ও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর— ‘আমি মেজর জিয়া বলছি ... অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।’ (পৃষ্ঠা ৬৮)

কয়েকদিন আগে তিনি জিয়াকে আবার মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ।

জেনারেল মতিনের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, জামায়াতপ্রীতি কী ভয়ানক তা লক্ষ্য করুন নিচের উদ্ধৃতিতে— 'টিএসসি এবং তার আশপাশে সংগীত, আবৃত্তি ও নাট্যচর্চার নামে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের বাঙালী জাতীয়তাবাদী ধারায় উদ্বুদ্ধ নানাবিধ সংগঠনে জড়ানো হচ্ছে অনেকদিন ধরে। অন্যদিকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণ-তরুণীদের মঞ্চ-টিভিতে অভিনয়, আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশনের সুযোগ করে দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে আরো এক ধরনের মোটিভেশন চালানো হচ্ছে। ফলে আমাদের এ সব শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা তাদের নিজস্ব জীবন দর্শন, সংস্কৃতি ও চিন্তা চেতনা থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। উল্লেখ্য, ২০০০ ইং সালে জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারীকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের ফলে কথিত বাঙালী জাতীয়তাবাদীদের নাচা-নাচি ও হৈ-হুল্লোরের মাত্রা অনেকাংশে বেড়ে যায়— উলুধ্বনিসহকারে এবং রাধাকৃষ্ণের সাজে সজ্জিত হয়ে এ দেশের মুসলমান তরুণ-তরুণীদের আনন্দ মিছিল চলতে থাকে দেশব্যাপী দিনের পর দিন। এছাড়া বাঙালী ঐতিহ্যের নামে মঙ্গল প্রদীপ, রাখিবন্ধন, সিথিতে সিঁদুরসহ নানাবিধ হিন্দুয়ানী সামাজিক আচার-আচরণকে আমাদের তরুণ প্রজন্মের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলা হচ্ছে। একইসাথে খুব সূক্ষ্মভাবে ওপার বাংলার বিধর্মীদের সাথে মুসলিম তরুণীদের বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে। বর্তমানে তা মুসলমান নামধারী মহিলা শিল্পীদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলেও তার ক্ষেত্র অচিরেই আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত হবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।' (পৃষ্ঠা ৮১)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রির চিন্তাভাবনা যখন এরকম তখন স্পষ্ট যে নির্বাচনে প্রগতিশীল বা মধ্যপন্থি দলের জিতে আসা অসম্ভব হবে। একই ঘটনা ঘটেছিল ২০০১ সালেও। এ বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সিভিল সমাজ যদি সতর্ক না হন তাহলে তাদের কপালে আরও অনেক দুর্ভোগ আছে।

আজ জীবনের অপরাহ্নে এসে এসব বক্তব্য শুনব, পড়ব, মনে হয় নি কখনও। কিন্তু বেঁচে থাকার এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বলব, এ ধরনের ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্রের জন্য সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। এদের এবং এদের যারা পৃষ্ঠপোষক তাদের রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ না করলে এ দেশের অস্তিত্ব সংকটময় হয়ে উঠবে।

২৪. ০১. ২০০৮